8 JAN 2017

ছাগল এখন গাছে চড়ে আম খায়

খন্দকার মুনতাসীর মামুন

আমার পুত্র 'ফড়িং'। সবেমাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সেদিন আচমকা আমার বুকটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা, তুমি কি জানো ছাগল যে গাছে চড়ে আম খায়।' আমি ওর কথা শুনে তো অবাক। হেসে বললাম 'দূর বোকা! তাই কি হয়? ছাগল কি আম খায়? ছাগল তো কাঁঠাল পাতা খায়, ঘাস খায়। আর গাছে চড়ে তো বানর।' কিন্তু মনে হলো ফড়িং যেন আমার কথাটা ঠিকমতো শুনছে না। ও দিব্যি বলে চলল, ওর নতুন বইয়ের ছবিতে নাকি ছাগল গাছে চড়ে আছে। আমার বিশ্বাস হলো না। ওর বই খুললাম এবং খুলে দেখলাম ফড়িং যা বলছে সত্যিই তাই। এতটুকু ভুল নেই। বাংলা পাঠ্য বইটির ১১ পাতায় অ-তে অজ (ছাগল) বোঝাতে গিয়ে ছাগলের ছবি জুড়ে দেয়া হয়েছে। ছবিতে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগল গাছে চড়ে মনের সুখে আম খাচ্ছে। আহা। কি চমৎকার দৃশ্য! শিশুদের আজকাল কত কি শেখানো হচ্ছে! আমাদের দেশের ছাগলেরও কত উন্নতি হয়েছে। তারা ঘাস-পাতা ছেড়ে গাছে চড়ে আম খাওয়া শুরু করেছে। আর যারা এই অতি 'দুর্লভ' চিত্র শিশুপাঠ্য হিসেবে বইয়ের পাতায় জুড়ে দিচ্ছেন তাদের 'কাণ্ডজ্ঞান' এবং 'জ্ঞানের বহর', 'পাণ্ডিত্য' দেখেও বিস্মিত না হয়ে পারছি না। এভাবে দেশের শিশুদের গড়ে তোলা হলে আগামীতে তারাও যে একদিন ছাগলকে গাছে চড়ানোর মতো আজব ও উদ্ভট কাজ করবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইংরেজি বছরের প্রথম দিন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে সারা দেশে পাঠ্যবই পৌঁছে দেয়া হয়। এটা এখন আমাদের দেশে নববর্ষ উদযাপনের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। নতুন বইয়ের ঘ্রাণ শুঁকে অশেষ আনন্দে মন ভাসিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয় নতুন ক্লাসের জন্য। বই বিতরণের এই উৎসবটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বছরজুড়ে কাজ করে যান পুস্তক লেখক, সম্পাদক এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা। কয়েক বছরের ধারাহিকতায় এবারও বছর শুরুর প্রথম দিনেই পাঠ্যবই হাতে পেয়েছে স্কুলশিক্ষার্থীরা। এ বছর দেশের ৪ কোটি ২৬ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ৩৬ কোটির বেশি পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছে। কাজটির গুরুত্ব অপরিসীম এজন্য যে এসব পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহরিত তথ্যসম্ভারই শিশু শিক্ষার্থীর মনোজাগতিক গঠনের ভিত রচনা করবে। কিন্তু যে দায়িত্ব নিয়ে এনসিটিবির কাজ করার কথা, তারা কি তা করতে পারছে? বই বিতরণের পরই নানা ধরনের ভুল নিয়ে সমালোচনায় পড়েছে সরকার। বইয়ের ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। পাঠ্যক্রমের স্থিতিশীলতায় মন না দিয়ে প্রতিবছরই নতুন কিছু উপস্থাপন করার এক ধরনের প্রবণতা দাঁড়িয়ে গেছে, যা শিক্ষার উপকরণ না হয়ে ইদানীং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিমতো তামাশা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে যে পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়, সে বইয়ের মুদ্রণ এবং কাগজ যেমন নিম্নমানের, তেমনি আদ্যোপান্ত থাকে তথ্য ও ভাষাগত ভুলে ভরা। এমনকি শুদ্ধ ইতিহাস চর্চাটাও অবহেলিত থাকছে অনেকাংশে অথবা পরিকল্পিতভাবে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে শিশুদের। এবারের পাঠ্যবইয়ে শিশুমনে চিন্তার বৈকল্য উসকে দিতে জেন্ডার বৈষম্যও প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকে রয়ে গেছে যাচ্ছেতাই ভুল, অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়, যা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন ফোরামে চলছে তুমুল বিতর্ক।

প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার নিরপেক্ষ শব্দচয়নই কাম্য। অথচ এবার দেখা গেল, বর্ণ বোঝানোর জন্য ও-তে 'ওলকপি'র পরিবর্তে দেয়া হয়েছে 'ওড়না'। জেন্ডারের বিষয়টি এখানে লক্ষিত হয়েছে। একজন ছাত্র কেন ওড়না চাইবে। তা ছাড়া, ওড়না কেন প্রয়োজন, একজন প্রথম শ্রেণীর ক্ষুদে শিক্ষার্থী জানতে চাইলে শিক্ষক এর কী উত্তর দেবেন? 'ওড়না' পরিহিত যে কন্যা শিশুকে দেখানো হয়েছে ছবিতে, তার পাশেই 'ঔ' বর্ণের ব্যবহার বোঝাতে একই মেয়েকে চিত্রিত করা হয়েছে 'ঔষধ' খাওয়া অবস্থায়। তখন তার গায়ে ওড়না ছিল না। অর্থাৎ, মেয়েদের যে ওড়না পরতে হয়, এমন একটি চিন্তা 'সূক্ষ্ম' কৌশলে শিশুদের মনে গেঁথে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর গল্পের বই আনন্দপাঠ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বইটিতে একটিও মৌলিক গল্প নেই। সাতটি গল্পের সব ক'টিই বিদেশি লেখকদের লেখার অনুবাদ। তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দু শিক্ষা বইয়ের পেছনে লেখা Do not Heart Anybody এটা আসলে হবে Do not Hurt Anybody অর্থাৎ কারও ক্ষতি করো না। পঞ্চম শ্রেণীর বইয়ে 'ঘোষণা' বানান 'ঘোষনা' আর সমুদ্র বানানকে লেখা হয়েছে দসমুদ'। তৃতীয় শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'-এ কুসুমকুমারী দাশের লেখা 'আদর্শ ছেলে' পদ্যটি মারাত্মকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। মূলে আছে 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে' অথচ বইয়ে ছাপা হয়েছে 'আমাদের দেশে সেই ছেলে কবে হবে?' মূলে আছে 'মানুষ হইতে হবে এই তার পণ'। ছাপানো হয়েছে 'মানুষ হতেই হবে'। মূলে আছে 'হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান'। 'খাট' শব্দটিকে বিকৃত করে লেখা হয়েছে 'খাটো'। এতে আমরা নিজেরা যে নিজেদেরই খাটো করে ফেললাম, সেটি কি কারও ভাবনায় এসেছে? কবিতা বা উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূলটা বর্জন করে নিজেদের ইচ্ছামতো লেখা যায় না। কখনো কখনো জায়গা সংকুলানের জন্য গল্পের কোন কোন অধ্যায় হয়তো বাদ দেয়া হয়; যদিও একজন গল্প লেখক এটাও মানবেন না। অথচ সেখানে কুসুমকুমারী দাসের বিখ্যাত কবিতাটিতে শব্দবিভ্রাট ঘটিয়ে কবিতার মানেটাই পাল্টে দেয়া হলো। কবির সৃষ্টির প্রতি অপমান করা হলো। কবিতাটি এখন ভুল শিখবে শিশুরা। অভিভাবকরা বলেছেন, শিশুদের পাঠ্য বইয়ে এমন ভুল হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তারা বলছেন, বই প্রকাশের প্রতিটি স্তরে ব্যর্থতার খেসারত দিচ্ছে কোটি কোটি শিক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু সালাহউদ্দিন বলেছেন, 'পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও সংযোজন-বিয়োজনের ক্ষেত্রে শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের তুলনায় আমলারা বেশি থাকেন বা তাদের বেশি রাখা হয়। অনেক সময় আমলাদের মর্জির ওপরই সবকিছু নির্ভর করে।' ড. সালাহউদ্দিন বলেন, 'বিশেষায়িত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে এনসিটিবির কমিটিগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না।' আমলাদের জ্ঞানের বহর যেমন আমরা জানি তেমনি তাদের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক লোকজনের যে প্রাধান্য রাখছে সেটাও জানি।

পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজনের নিয়ম হচ্ছে, বিদ্যালয় পর্যায়ে ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ, তার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কর্মশালা এবং তার আলোকে এনসিসিসিতে (ন্যাশনাল কারিকুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কিন্তু এবারের পাঠ্যপুস্তকের সংযোজন-বিয়োজনের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত হয়েছে এনসিসিসির সভায়। এনসিসিসির প্রধান হচ্ছেন শিক্ষাসচিব। জানা গেছে, গত বছরের ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত এনসিসিসির সভায় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একটি তালিকা দিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করে সে অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে সংযোজন-বিয়োজন করে নেয়ার কথা বলেন। তার এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই এবারের পরিবর্তন এসেছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন গণমাধ্যমকে বলেন, যথাযথ কমিটির মাধ্যমে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কমিটি যেটা ভালো মনে করেছে সেটাই করেছে। আমাদের প্রশ্ন হলো, যদি সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই বই প্রণয়ন করা হয় তবে বইয়ের ভেতর এত ভুল কেন? এত উদ্দেশ্যমূলক সংযোজন-বিয়োজন কেন? কী উদ্দেশ্যে এসব হচ্ছে? বই পরিমার্জন করে, কার উদ্দেশ্য সাধন করা হচ্ছে?

দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের বাংলা বই থেকে ২০১২ সালে যে বিষয়গুলো বাদ পড়েছিল তার সবই আবার ফিরে এসেছে ২০১৭ সালের সংস্করণে। আবার ২০১২ সালের বইয়ে নতুন যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে পাঠ্যপুস্তকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে প্রণীত শিক্ষাক্রম আবার চালু হলো। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে ২০০৩ সালে পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। প্রতিটি শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের বইয়ে ধর্মীয় বিষয় ও ভাবধারা যুক্ত করা হয়। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করে। এর আলোকে নতুন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয় ২০১২ সালে, যা শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছায় ২০১৩ সালে। তখন বলা হয়েছিল, বাংলা বিষয়কে সাহিত্যসমৃদ্ধ এবং সর্বজনীন করার জন্য ধর্মীয় বিষয়গুলো সরিয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বইয়ের নতুন পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তিনি গণমাধ্যমকে শুধু এটুকু বলেছেন, এ দেশে ধর্মের রাজনীতির ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন চাইলেও অনেক কিছু করা সম্ভব নয়। তবে আমরা মনে করি, এটা যৌক্তিক উত্তর নয়। গ্রহণযোগ্যও নয়। চাওয়ার মতো চাইলে, কাজ করার আগ্রহ থাকলে সব কাজই করা যায়। যেখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে সেখানে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুগোপযোগী শিক্ষা থেকে কেন বঞ্চিত হবে আমাদের সন্তান? প্রাথমিক শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম কেন পরিবর্তিত হবে স্বার্থান্বেষীদের ইশারায়?

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছেন, শিশুরা প্রকৃতির কোলে মানুষ হবে। প্রকৃতি হবে তাদের গুরু। প্রত্যেক শিশু হবে প্রকৃতির শিষ্য। কবি সুনির্মল বসু বলেছেন শিশুরা বলবে 'বিশ্ব জোড়া পাঠশালা মোর/সবার আমি ছাত্র'। আর দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চারটি গুণ আয়ত্ত করা। যে চারটি বৈশিষ্ট্য সম্মিলিতভাবে আদর্শ চরিত্রের ভিত্তি রচনা করতে পারে সেগুলো হলো : উদ্যম, সাহস, সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু ভুল শিক্ষা পেয়ে চার গুণ কেন, কোনকিছুই অর্জন করা সম্ভব হবে না। যারা শিশুর মানসিক বিকাশ, পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিত চিন্তা না করে খামখেয়ালিপনার মধ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং যারা তা অনুমোদন দেন; তারা শিশুদের ভুলে ভরা জীবন ছাড়া অন্য কিছু চেনাতে পারবেন না।

এ বছরের পাঠ্যবইয়ে অসংখ্য ভুল ও বইয়ের মান নিয়ে চলছে তীব্র সমালোচনা। এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে। বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে নতুন বছরের প্রথম ক্লাসেই পাঠ্যবই তুলে দেয়া হয়েছিল শিক্ষার্থীদের হাতে। তড়িঘড়ি করে ছাপানো এসব পাঠ্যবইয়ে ভুল তথ্যের কারণে বিনামূল্যে বই বিতরণের ইতিবাচক অর্জন ম্লান হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে বইয়ের সম্পাদনা ও মুদ্রণের সঙ্গে জড়িতদের দায়িত্ব নিয়ে। নতুন বইয়ে বিভিন্ন তথ্যবিভ্রাটে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নবাণে বিব্রত হচ্ছেন শিক্ষক ও অভিভাবক। ভুল তথ্যের অভিযোগ স্বীকার করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। তারা বলেছে তদন্ত করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখন প্রশ্ন হলো, নতুন এই বছর জুড়ে শিশুর মানসিকতায় নারী ও পুরুষের বিভাজিত ভাবনার বীজটি যে উপ্ত হবে, ভুল পদ্যের ছন্দবিভ্রাট যে মনে গেঁথে যাবে আর আঘাতের জায়গায় হৃদয় বসিয়ে দিয়ে জীবনের মূল মর্মবাণীটাই যে পাল্টে ফেলা হবে; তার দায়টা তবে কে নেবে? সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যে ভুল প্র্যাকটিস শুরু করেছি, সেই ভুলের সংস্কৃতি থেকে আমরা কি আদৌ বেরোতে পারব? আমাদের শিশুরাও কি আমাদের অপরাধে ভুল শিক্ষার অন্ধ গলিতে ঘুরপাক খাবে? আমাদের ভুলের মাশুল কি গুনতে হবে আমাদেরই নিরপরাধ সন্তানদের। হয়তো এর উত্তর খুঁজে দেখতে হবে সবাইকে।

[লেখক : সাংবাদিক]
suva.muntasir@gmail.com